OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 299 - 309
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 299 – 309
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

দেবী শীতলা ও শীতলার আখ্যান : উৎস সন্ধানে

শিবনাথ দত্ত
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বিশ্বভারতী
Email ID : shibuvb1993@gmail.com

Received Date 21. 09. 2024
Selection Date 17. 10. 2024

Keyword
Sitala, Spring, Disease, Temple, Hariti, Sitala Mangal, Musarika, Krishnaram Das, Nityananda Chakraborty, Small Pox.

Abstract
The paper discusses religious and cultural narratives about Godess Sitala, 'Deity of Diseases'. Sitala There are various texts written in the 17th and 18th centuries as Mangalkavya elaborated Sitala Saga.

She was the goddess of smallpox appeared in different Sanskrit ayurvedic medical texts and Puranas. Sitala, has a history that spans across different states and regions of India and can be traced back to the middle-ages. The worship of Sitala is not restricted to India alone but can be observed in Nepal, Bangladesh and the Punjab province of Pakistan. There are many arguments and controversies regarding the origin and characteristics of this goddess. Researchers mentioned She is the Puranic version of 'Apodevi' the Vedic goddess of Water. In different Puranic texts she is claimed to be able to solve poverty and misfortune, and can also cure children's diseases, Scholars like Hara Prasad Shastri and Dinesh Chandra Sen argue that the deity 'Hariti' or 'Parnashabari' found in Buddhist Tantra later became 'Sitala'. Though the history of Her origin is fraught with controversies, based on numerous evidences, it can be stated that it is rooted in the folk traditions of lower-caste, marginal communities like Dom, Shabar, Hadi, Lodha, Chandal and so on. There are also varying customs and rituals regarding how she is worshipped and her idols are made in different regions.

In Bengal, a literary tradition known as 'Sitala Mangal' has developed which celebrates and praises the heroics and exploits of Goddess Sitala. Many poets like Krishnaram Das, Nityananda Chakraborty, Sri Krishna Kinkar and Manikram Ganguly have written the different 'palas' (episodes) of Sitala Mangal.

It must be acknowledged that when it comes to the preservation of our heritage and the study of our history and traditions, Sitala Mangal remain very relevant and significant. The popularity and preponderance of Mangal kavyas like 'Dharma Mangal', 'Mansa Mangal' and 'Chandi Mangal' in our literary circles have resulted in unjustified neglect and ignorance of some other precious Mangal kavyas like 'Sitala Mangal', 'Ganga Mangal', 'Lakshmi Mangal' and so on. In all these lesser-known and often overlooked Mangal kavyas, one can find original and insightful depictions of social and cultural realities of earlier eras. Even though progress in medical science has made it

possible to uproot the once deadly small pox, Goddess Sitala is still worshipped with the same zest in all over India.

Discussion

ভারতবর্ষের যে প্রচলিত দেবসংস্কৃতি তার মধ্যে দেখা যায় বিভিন্ন দেবদেবীর আবির্ভাব ঘটেছে বিভিন্ন সময়পর্বে। এই দেবীরা ভক্তবৃন্দের কাছে কখনো হয়ে 'শক্তিদায়িনী' কখনো বা 'মুক্তিদায়িনী'। সর্প, ব্যাঘ্র শঙ্কা থেকে যেমন তাঁরা অভয় প্রদান করেছেন, তেমনই দেখিয়েছেন রোগ-ব্যাধি-জ্বরা থেকে মুক্তির মার্গ। এমনই এক দেবী হলেন বসন্তরোগহারিণী 'দেবী শীতলা'।

দেবী শীতলা বসন্তরোগের অধিষ্ঠাত্রী ও রোগপ্রশমনকর্ত্রী। তিনি যেমন উঠেছেন রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি করেন তেমনি তিনি সমস্ত রোগ ব্যাধি থেকে মুক্তি দিয়ে শীতলতা প্রদান করেন। দেবী মনসা যেমন হলেন সর্পবিষহারিণী ও ওলাবিবি যেমন কলেরা রোগের দেবী তেমনি শীতলাও হলেন বসন্তরোগহারিণী। অন্যদিকে পুরাণে এই দেবী কৃষিদেবী রূপে আবির্ভূতা, তিনিই দারিদ্র্যবিনাশিনী, সংসার দুঃখনাশিনী। আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বে লিখিত আয়ুর্বেদশাস্ত্রে 'বিষচিকিৎসা প্রকরণ'-এ বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও রোগ নিরাময়কর্ত্রী হিসাবে দেবী শীতলার উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে 'মসূরিকা' নামে একধরণের ব্যাধির সন্ধান মেলে। অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক এই রোগে কোনো ব্যক্তি আক্রান্ত হলে তার শরীরে জ্বর ও তাম্রাভ গুটি লক্ষ্য করা যেত। এমনকি 'অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা' গ্রন্থে মারাত্মক এই রোগে আক্রান্ত রুগীর মৃত্যুর সম্ভাবনার কথাও উল্লিখিত হয়েছে। অষ্টম শতাব্দীতে জনৈক মাধবকর রচিত 'মাধবনিদানে' মসূরিকাকে গুটিবসন্তের সমতুল্য বলে গণ্য করা হয়েছে। আয়ুর্বেদশাস্ত্রের অন্তর্গত 'ভাবপ্রকাশ'-এ দেবী শীতলা সম্পর্কে বলা হয়েছে –

"দেব্যাশীতলয়াক্রান্ত মসুর্যৈব হি শীতলা
জ্বরয়েচ্চ যথা ভূতাধিষ্ঠিত বিষমজ।..."[১]

'ভাব প্রকাশ' গ্রন্থের রচয়িতা পণ্ডিত ভাবমিশ্র 'মসূরিকা' ব্যাধিকেই 'শীতলা' নামে চিহ্নিত।

'মসূরিকা' ব্যাধির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে প্রথমে জ্বর ও পরে বিস্ফোটকসমূহের লক্ষণ দেখা দেয়। সপ্তাহান্তে এই বিস্ফোটক ব্যক্তির সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে। একুশ দিনের মাথায় তা শুষ্ক হয়ে স্খলিত হতে দেখা যায়। বিস্ফোটকসমূহ যদি পেকে গিয়ে তা থেকে রস নিঃসৃত হয়, তাহলে বনগোময়ভস্ম ছড়িয়ে দেওয়ার নিদানও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে উল্লেখিত হয়েছে। রোগীর শরীরে বিস্ফোটকসমূহকে কীটানুমুক্ত রাখার জন্য ব্যবহার করা হয় নিমের ডাল, পদ্মের পাপড়ি। আক্রান্ত রোগীকে অত্যন্ত পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও নির্জন স্থানে রাখার বিধান রয়েছে। কোনো অশুচি ব্যক্তির স্পর্শ থেকে রোগীকে মুক্ত রাখার নিদানও প্রাচীন পণ্ডিতরা দিয়েছেন।

প্রধানত দেখা যায় গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে বসন্ত রোগের আবির্ভাব ঘটে, যা বাংলার গ্রামাঞ্চলে লোকমুখে 'মায়ের দয়া' নামে আখ্যায়িত। বিজ্ঞানের যুক্তি যাই থাকুক না কেন এই রোগে কেউ আক্রান্ত হলে তার থেকে দূরত্ব রেখে চলাই ভালো বা তার কোনো সংস্পর্শে না আসাই যুক্তিসংগত বলে মনে করে গ্রামে বসবাসকারী মানুষ। যে গৃহে কোনো ব্যক্তি 'মায়ের দয়া' বা বসন্ত রোগের কবলে পড়ে সেই গৃহে সাতদিন বা একুশ দিন যাবৎ নিরামিষ খাওয়ার প্রথা লক্ষ্য করা যায়।

শীতলা বা বসন্ত রোগের প্রশমনের জন্য গ্রামাঞ্চলে নানারকম বিধান প্রচলিত রয়েছে। যেমন নিম ও বহেড়ার বীজকের হরিদ্রার সঙ্গে পেষণ করে শীতল জলে মিশিয়ে তা রোগীকে পান করালে এই রোগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। এছাড়াও শীতলা দেবীর প্রশমনের জন্য দেবীর পূজার বিধানও দেওয়া হয়েছে। জপ, হোম, যজ্ঞ, বলি ইত্যাদির মধ্যে দিয়েও শীতলাকে সন্তুষ্ট করা হয়।

ভারতবর্ষে শীতলা পূজার ঐতিহ্য যে সুপ্রাচীন তাঁর একাধিক প্রমাণ উঠে আসে এদেশের প্রাচীন মন্দিরগুলিতে প্রাপ্ত শীতলা দেবীর মূর্তিসমূহের দ্বারা। দেবী শীতলার প্রাচীনতম মূর্তিটি পাওয়া গেছে মধ্যপ্রদেশের মধখেড়া গ্রামের সূর্যমন্দিরে। মন্দিরটি অষ্টম-একাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়পর্বে গুর্জর-প্রতিহার বংশের শাসনকালে নির্মিত। মধখেড়ার

মন্দিরে প্রাপ্ত উৎকীর্ণ মূর্তিটিতে দেবী শীতলা দিগম্বরা, গর্দভবাহনা, দেবীর মাথায় একটি চক্রাকার পুষ্পাকৃতির ব্যজনীও লক্ষ্য করা যায়। এদেশের গ্রীষ্মপ্রধান দুটি রাজ্য রাজস্থান ও গুজরাটে অন্যান্য প্রাচীন শীতলা মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায়। রাজস্থানে যোধপুরের ওসিয়ায় শচ্চিকামাতার মন্দিরটিও প্রতিহার রাজবংশের শাসনপর্বে নির্মিত। মন্দিরে রক্ষিত একটি ১২৩৪ সম্বৎ (১১৭৮ খ্রিস্টাব্দ) এর শিলালেখে পাঁচজন দেবদেবীর নাম খোদিত আছে, যথা— চণ্ডিকা, শীতলা, শচ্চিকাদেবী, ক্ষেমঙ্করী ও ক্ষেত্রপাল। এই মন্দিরে একটি মূর্তিতে শীতলার অনুরূপ দিগম্বরা গর্দভবাহিনী দেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে। গুজরাটের মধেরায় দ্বাদশ শতাব্দীর সূর্য মন্দিরে দেবী শীতলার মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। মধেরার সূর্য মন্দিরটি ১০২৬-২৭ খ্রিস্টাব্দের সময়পর্বে চৌলুক্যবংশীয় রাজা প্রথম ভীমের রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল। মহাতীর্থ ক্ষেত্র নামে খ্যাত কাশীর 'দশাশ্বমেধ' ঘাটে একটি সুপ্রাচীন মন্দির অবস্থিত। বিহারের অন্তর্গত শাশারামপুরের নিকটস্থ এক গ্রামে একটি শীতলার মন্দির আছে। এছাড়াও উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরের বসবাসকারী 'ধাঙর' জাতির মানুষেরা 'শীতলাভবানি' নামে বসন্তরোগের এক দেবীর পূজা করে থাকেন। এই সব মন্দিরগুলি প্রমাণ করে 'রোগেশ্বরী' শীতলার আধিপত্য ও তাঁর প্রাচীনত্বকে। বাংলাদেশে এই দেবী শীতলা নামে পূজিতা হলেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি বিভিন্ন নামে পূজা পেয়ে থাকেন। যেমন– ওড়িশায় তিনি 'ঠাকুরানী', অসমে তিনি 'আই', বা 'আই-অটোয়া', মহারাষ্ট্রে 'মাতা-মা', মধ্যপ্রদেশে 'মারই', উত্তরপ্রদেশে 'শীতলা-ভবানী', অন্ধ্রপ্রদেশে 'সোলাপুরী মা', বিহারে 'মহারানীমা' ইত্যাদি।

দেবী শীতলা শুধু বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রীই নন, তিনি সর্বদুঃখনাশিনী ও সর্বকল্যাণময়ী। মহারাষ্ট্রের পুনায় কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে মা শীতলার পূজার প্রচলন রয়েছে। বোম্বাই প্রদেশে অপুত্রক মহিলারা পুত্রলাভের উদ্দেশ্যে দেবী শীতলার পূজা করে থাকেন। পাঞ্জাবে বিবাহিত নারীরা তাদের সন্তানের কল্যাণ বা মঙ্গলার্থে বটবৃক্ষের নিচে 'বিবারবিয়ন' নামে এক কালো পাথর বিশিষ্ট এক দেবী কল্পনা করে পূজা করে থাকেন। বসন্ত হল এই 'বিবারবিয়ন' দেবীর অন্যতম সহচর। এছাড়াও বহির্ভারতের মধ্যে পাকিস্তানের অন্তর্গত পাঞ্জাব প্রদেশেও শীতলাপূজার প্রচলন আছে। নেপালেও দেবী শীতলা প্রাচীন কাল থেকে পূজিত হয়ে আসছেন। শীতলাকে কেন্দ্র করে নেপালে 'শীতলা-মাজু' নামের বিশেষ গানও প্রচলিত আছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলভেদে একাধিক নামে শীতলাদেবীর পূজা হয়ে থাকে। অধুনা বাংলাদেশেও যশোহর, খুলনা জেলায় বসন্তকালীন সময়ে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে গ্রামের এয়োতি নারীগণ দেবী শীতলার নাম করে তাঁর প্রতীকরূপে 'মঙ্গলকলস' স্থাপন করে পূজার রীতি রয়েছে। একে বলা হয় 'ঘট আউলানো'। এই পূজা উপলক্ষ্যে চলে নৃত্য-গীত –

"পদ্মের আসন-পদ্মের চাটন, পদ্মের সিংহাসন।
পদ্মপত্রে জন্ম নিলেন সত্যনারায়ণ।।
ঘট কেন নড়ে দেবী, আসন কেন টলে।
ঐ আসিছে মা শীতলা এই আসনের পরে।"[২]

এই নৃত্য-গীতের পাশাপাশি চলে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে 'মাঙন'। অবশেষে শীতলাষষ্ঠী ও শীতলা-অষ্টমীতে ব্রত আকারে দেবী শীতলার পূজার সমাপ্তি ঘটে। পশ্চিম বাংলার দক্ষিণে অবস্থিত সুন্দরবন অঞ্চলে রাজবংশি ও মালো সম্প্রদায়ের লোকেরা 'বনবিবি'র সম্মানার্থে দেবী শীতলার বাৎসরিক পূজার আয়োজন করে থাকে। আর ওই পূজা হয়ে থাকে ওই গ্রামের সংগৃহীত চাল ও টাকায়। গ্রামের প্রবীণ মহিলারা প্রদীপ হাতে বাড়ি বাড়ি ঘুরে পূজার খরচের যে চাল ও টাকা সংগ্রহ করে থাকেন তাকে 'মাঙন' বলা হয়। আর পূজা চলাকালীন সময়ে সারারাতব্যাপী গাওয়া হয় 'জাগরণ' গান। রাঢ় অধ্যুষিত লালমাটির দেশ বীরভূমের কোনো কোনো অঞ্চলে দেখা যায় যে সেখানে শীতলা ও মনসা একাকার হয়ে গিয়েছেন, তখন তিনি 'পদ্মাবতী মা'। ওড়িশার নিকটবর্তী জঙ্গল অধ্যুষিত পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কিছু কিছু অঞ্চলে দেখা যায় শীতলা 'বসন্তবুড়ি' নামে পরিচিতা। পশ্চিম মেদিনীপুরের পাথরা গ্রামে একটি অষ্টাদশ শতকের প্রাচীন শীতলামন্দির আছে, এই মন্দিরটি 'বুড়িমার থান' নামে পরিচিত। আবার বাংলার পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, সিংভূম ইত্যাদি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শীতলা শুধু বসন্তের দেবী রূপেই চিহ্নিত নন – কৃষি ও প্রজননের শক্তি আরোপিত হওয়ায় তিনি সেখানে 'গ্রামধাত্রী'

OPEN ACCESS Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 299 - 309
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রূপেও প্রতিষ্ঠিতা। মেদিনীপুরের কাঁথি, তমলুক, ঘাটাল এই সমস্ত অঞ্চলে শারদীয়া দুর্গাপূজার মতই অত্যন্ত সাড়ম্বরপূর্ণ ভাবেই দেবী শীতলার পূজা হয়ে থাকে, কোনো কোনো গৃহে তিনি 'কুলদেবী' রূপে পূজিতা।

বরাভয়দাত্রী ও সকল রোগ তাপ প্রশমনকারিণীরূপে দেবী শীতলা স্বীকৃতা হয়ে আছেন। এই দেবী শীতলার উদ্ভব বা উৎপত্তি বিষয়ে বিভিন্ন মতামত লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন শাস্ত্রীয় গ্রন্থের পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট গবেষকগণ দেবী শীতলার উদ্ভব ও স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা ও মতামত প্রদান করেছেন। পূর্বোক্ত শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি ও বিশিষ্ট গবেষকদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শীতলার উৎপত্তি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি।

বৈদিক সাহিত্যে শীতলার অস্তিত্ব আছে কি নেই এই সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া যায়নি। তবে কোনো কোনো পণ্ডিত দেবী শীতলার সঙ্গে বৈদিক 'অপ্' দেবীর সাদৃশ্য দেখার চেষ্টা করেছেন। শ্রদ্ধেয় ডঃ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩০২ সালে 'সমীরণ' পত্রিকায় 'শীতলা পূজা প্রকৃত কী?' নামক একটি প্রবন্ধ লেখেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি বহু গবেষণা ও আলোচনার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে বৈদিক শাস্ত্রে যিনি 'অপ্' দেবীরূপে পূজিতা হতেন তিনি পুরাণে শীতলাদেবীতে পরিণত হয়েছেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখিয়েছেন দেবী শীতলা হলেন পরিচ্ছন্নতার আধার। ১৩০৫ সালে শ্রী ব্যোমকেশ মুস্তাফী সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত 'শীতলামঙ্গল' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি (ব্যোমকেশ মুস্তাফী) ক্ষিতীন্দ্রনাথ মহাশয়ের মত প্রতিষ্ঠার জন্য উল্লেখ করেন -

> "শীতলার মৃণালতন্তুসদৃশী সুক্ষমূর্তি ও জলমধ্যে পূজার বিশেষত্ব হইতে ক্রমশঃ আলোচনা করিয়া এবং তৎসঙ্গে আপোমার্জ্জনের মন্ত্রগুলি ব্যাখ্যাপূর্ব্বক দেখাইয়াছেন যে বৈদিক শাস্ত্রে যিনি 'অপ্ দেবী' নামে স্তুতা হইতেন, তিনিই পুরাণকারের হস্তে শীতলা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।"[৩]

ক্ষিতীন্দ্রনাথবাবুর মতই আরও অনেকেই মনে করেছেন বৈদিক অপ্ দেবীর পৌরাণিক সংস্করণ হল দেবী শীতলা। স্বামী নির্মলানন্দের মতে 'শীতলা জলাভিমানী দেবতা'। শীতলার হস্তে যে জলপূর্ণ কুম্ভ তা অপ্ দেবতার বৈশিষ্ট্য পঞ্চানন মণ্ডলও হরিদেবের 'শীতলামঙ্গল' সম্পাদনাকালে এই প্রসঙ্গে বলেন দেবী শীতলা হলেন রুদ্রকন্যা। তিনি সূর্য ও সোমের প্রতীক। তাঁর কক্ষের কুম্ভ অপ্‌দেবীর আশ্রয়। আমাদের মনে রাখতে হবে বেদে আরোগ্য দেবতা হিসাবে কিন্তু শীতলাকে পাওয়া যায় না। বেদে আরোগ্য দেবতা কখনো সূর্য, কখনো অপ্‌দেবী। আবার বিশ্বকোষকার পরমশ্রদ্ধাস্পদ নগেন্দ্রনাথ বসু অথর্ববেদে যে 'তক্মন্' শব্দের উল্লেখ আছে সেই 'তক্মন্' শব্দের অর্থ করেছেন 'শীতলা'। ব্যোমকেশ মুস্তাফী ১৩০৫ সালে সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত 'শীতলামঙ্গল' শীর্ষক প্রবন্ধের আলোচনায় 'তক্মন্' শব্দের প্রসঙ্গ এনে তিনি বলেছেন,

> "অথর্ব্ববেদে ১/২৫/১, ৫/২১/১, ৪/১/৯, ৬০/১৬/৬, ১৯/৩৪/১০, ১১/২/২৬, ২০/১ ও ৩৯/১ প্রভৃতি স্থলে 'তক্মন্' শব্দ আছে।"[৪]

'Sacred Book of the East' নামে যে গ্রন্থমালা আছে সেই ইংরেজি গ্রন্থমালার মধ্যে ১৮৯৬ সালে ডঃ মরিস ব্লুমফিল্ড একটি আলোচনা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। অথর্ববেদে অধিকাংশ ইংরেজি অনুবাদকৃত 'তক্মন্' এই শব্দের অর্থ উক্ত গ্রন্থে তিনি করেছেন 'জ্বর'। এই গ্রন্থের ১/৫/২২/৩ শ্লোকের অনুবাদ থেকে জানতে পারা যায় –

> "The takman that a spotted covered with spots; like reddish sediments, that thou; (Oh plant) unremitting potency drive away down below,"[৫]

উপরোক্ত উদ্ধৃতির মধ্যে উল্লিখিত 'Spot like reddish Sediments' শব্দগুলির দ্বারা যদি হাম বসন্ত বোঝায় তাহলে হাম বসন্ত আশ্রিত 'জ্বর' এরকম বললেও বলা যেতে পারে কিন্তু এর দ্বারা বসন্ত অধিষ্ঠাত্রী দেবী শীতলাকে বোঝায় না। এখানে তাই শীতলার অস্তিত্ব খোঁজা বৃথা সেদিক থেকে দেখলে বৈদিক সাহিত্যে দেবী শীতলার অস্তিত্ব অধিকাংশই অনুমাননির্ভর তাই, শীতলার অস্তিত্ব জানতে বা বুঝতে গেলে আমাদের পুরাণ ও তন্ত্রের সাহায্য নেওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত হবে।

'স্কন্দপুরাণ'-এর অন্তর্গত আবন্ত্যখণ্ডে মর্কটেশ্বর তীর্থমহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে দেবী শীতলার মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। সেখানে তিনি শুধু বিস্ফোটকনাশিনীই নন তিনি সেখানে দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্যনিবারণকারিণী দেবীরূপেও চিহ্নিত। তাই পুরাণকার বলেছেন –

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 299 - 309
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা গোশতস্য ফলং লভেৎ।
বিস্ফোটানাং প্রশাস্ত্যর্থং বালানাং চৈব কারণে।।
মাপেন মাপিতান্ কৃত্বা মনুরাংস্তত্র কুট্টয়েৎ।
শীতলায়াঃ প্রভাবেন বালাঃ সন্ত নিরামায়াঃ।।
যে পশ্যন্তি নরা ভক্ত্যা শীতলাং দুরিতাপহাম্।
ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিন্ন দারিদ্র্যং দ্বিজোত্তম।।"[৬]

অর্থাৎ, মর্কটেশ্বর তীর্থে স্নান করলে শিশুগণের রোগমুক্তি ঘটে, শীতলার প্রভাবে দেবীর দর্শনলাভে সমস্তরকম দারিদ্র্য দুষ্কৃত দূর করেন, তিনি সমস্ত গ্রহপীড়া, রোগ, ভয়ও দূর করেন। দারিদ্র্য দূর করে থাকেন দেবী লক্ষ্মী। তবে দেবী শীতলাও দারিদ্র্য দূর করেন। আবার বালাধিষ্ঠাত্রী দেবী ষষ্ঠী বালকদের সর্বরোগ নিরাময়কারিণী রূপে প্রতিষ্ঠাতা। শীতলাও 'স্কন্দপুরাণ'-এর আবন্ত্যখণ্ডের বর্ণনা অনুযায়ী শিশুদের রোগ-নিরাময় কর্ত্রীরূপে আবির্ভূতা। বালাধিষ্ঠাত্রী ষষ্ঠীরও আর এক নাম শীতলা। শ্রীপঞ্চমীর পরের দিন শিশুদের মঙ্গলার্থে কোনো কোনো গৃহে ষষ্ঠীপূজা হয় যা শীতলাষষ্ঠী নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, বসন্তরোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শীতলা শিশুবয়স্ক নির্বিশেষে সকলেরই রোগ তাপ প্রশমন করেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে,

"বসন্তরোগ বালবৃদ্ধ-নির্বিশেষে সমান ভয়াবহ।"[৭]

তাই পরবর্তী সময়ে দেবী শীতলাই বিস্ফোটক বা বসন্তের দেবীতে পরিণত হলেন।

'মার্কণ্ডেয়পুরাণ'-এ দেবী শীতলা 'অলক্ষ্মী' হিসাবে উপস্থাপিত। আবার ভারতীয় অথর্ববেদমূলক শাস্ত্রীয় গ্রন্থের 'ভাবপ্রকাশ'-এ 'মসূরিকা' চিকিৎসায় যে ব্যাধির কথা জানতে পারা যায়, যে অংশে বসন্তরোগকে শীতলা বলা হয়েছে এই শ্লোকটি 'স্কন্দপুরাণ'-এর কাশীখণ্ড থেকে গৃহীত বলে মনে করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য উক্ত শ্লোকটি পূর্বেই এই অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। 'স্কন্দপুরাণ'-এর কাশীখণ্ড থেকে যে শ্লোকটি গৃহীত হয়েছে বলে ধারণা করা হয় কোনো কোনো পণ্ডিত এর দ্বিমত পোষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ব্যোমকেশ মুস্তাফীর বক্তব্য হল, "ভাবপ্রকাশে মসূরিকা-চিকিৎসায় যে স্থলে (২য় খণ্ড ৪র্থ ভাগে) শীতলার স্তবাদি পাঠের ব্যবস্থা আছে, সেই স্থলে শীতলাষ্টকের নিম্নে লিখিত আছে, -

"ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে শীতলাষ্টকসমাপ্তম্।"

ইহা হইতে কাশীখণ্ডের নাম পাওয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে সংগৃহীত ৯৩০ শকের হস্তলিখিত পুঁথি ও কাশীতে মুদ্রিত কাশীখণ্ডের যে বাঙ্গালা অনুবাদ আছে এবং বটতলার মুদ্রিত বাঙ্গালা কাশীখণ্ডে শীতলার নাম গন্ধও দেখিলাম না।"[৮]

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের অভিমত হল,

"পরবর্তীকালে শীতলা দেবীর পৌরাণিক আভিজাত্য স্থাপন করিবার জন্য কয়েকটি শ্লোক কেহ রচনা করিয়া কাশীখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন।"[৯]

অন্যদিকে বিভিন্ন তন্ত্রমূলক শাস্ত্রীয় গ্রন্থে, যথা— 'মুণ্ডমালাতন্ত্র', 'কলিদুঃখবিমচনীতন্ত্র'-এ বিভিন্ন রূপে দেবী শীতলা সেখানে কালীর অংশরূপে প্রতিষ্ঠিতা। 'কলিদুঃখবিমচনীতন্ত্র'-এ শীতলা ও চণ্ডিকাকে দেবীরূপে প্রায় সমান আসনে মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। শীতলার যে পূজাবিধি বা নিয়মাবলী রয়েছে তা 'পিচ্ছিলাতন্ত্র' থেকে গৃহীত আর 'স্কন্দপুরাণ'-এ পাওয়া যায় শীতলার ধ্যানমন্ত্র। 'পিচ্ছিলাতন্ত্র'-এ শীতলার যে রূপবর্ণনা করা হয়েছে তা হল এই রকম—

"শ্বেতাঙ্গীং রাসভস্থাং করযুগলবিলসসমার্জ্জনীপূর্ণকুম্ভম্।
মার্জ্জন্যাপূর্ণকুম্ভাদমৃতময়জলং তাপশান্ত্যৈঃ ক্ষিপন্তীম্।।
দিগ্বস্ত্রাং মূর্দ্ধি সূর্পাং কনকমণিগনৈর্ভূ ধিতঙ্গীং ত্রিনেত্রাম্
বিস্ফোটাদুপ্রতাপ প্রশমনকরী শীতলা ত্বাং ভজামি।।"[১০]

অর্থাৎ, শীতলা শ্বেতবর্ণা, গর্দভবাহনা, তাঁর দুই হস্তে থাকে পূর্ণকুম্ভ ও সম্মার্জনী, যার দ্বারা তিনি অমৃতময় জল বর্ষণ করে রোগ তাপ শান্ত করেন। তিনি দিগম্বরী অর্থাৎ দশদিক পরিব্যপ্ত করে থাকেন। তাঁর মস্তিষ্কে থাকে সূর্প বা কুলা, তিনি ত্রিনেত্রা এবং বিস্ফোটকের কঠিন তাপ প্রশমনকারিনী। 'স্কন্দপুরাণ'-এ উক্ত ধ্যানমন্ত্রটি হল—

"নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্।
মার্জ্জনীকলসোপেতাং সূর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্।।
বিস্ফোটকবিশীর্ণানাম্ ত্বামকামৃতবর্ষিণীম্।।
গলগণ্ডগ্রন্থরোগা যে চান্যে দারুণা নৃণাং।
ত্বদনুধ্যানমাত্রেণ শীতলে যান্তি তে ক্ষয়ম্।।"[১১]

বোঝা গেল, 'পিচ্ছিলাতন্ত্র'-এ শীতলার যে রূপ বর্ণনা হয়েছে স্কন্দপুরাণোক্ত ওই শীতলার একই রূপ অর্থাৎ দেবীর যে বসন, যে ভূষণ, যে বাহন সমস্তই 'পিচ্ছিলাতন্ত্র'-এ উক্ত শীতলার মত। শুধুমাত্র 'পিচ্ছিলাতন্ত্র'-এ শীতলা বিস্ফোটক নাশ করেন, অন্যদিকে 'স্কন্দপুরাণ'-এ শীতলা বিস্ফোটোক ছাড়াও গলগণ্ড ও অন্যান্য আরও কঠিন রোগ নাশ করেন। এছাড়াও 'স্কন্দপুরাণ'-এর এই ধ্যানমন্ত্রে শীতলাদেবীর এক সূক্ষ্মমূর্তির কথা বলা হয়েছে। শীতলা পূজারীরা মনে করেন বর্তমানে দেবীর যে পূজাবিধান রয়েছে তা 'স্কন্দপুরাণ' থেকে গৃহীত ও 'পিচ্ছিলাতন্ত্র' থেকে সংকলিত।

বাংলা সাহিত্যের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁদের গ্রন্থে শীতলার উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্বন্ধে নানান বিতর্কিত মতামত উপস্থাপন করেছেন। বৌদ্ধতন্ত্রে 'হারিতী' নামে আর এক দেবীর কথা জানতে পারা যায়। বৌদ্ধতন্ত্রে যিনি যক্ষিণী ও শিশুহন্তা হিসাবে প্রসিদ্ধা ছিলেন। চিন দেশের প্রচলিত কাহিনির বিশ্বাস অনুযায়ী 'হারিতী' শিশুহননকারিণী ও যক্ষিণী কুবেরের পত্নী কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রে 'হারিতী' শিশুরক্ষয়িত্রী, শিশুপালিকা ও সন্তানদাত্রী। কেউ কেউ মনে করে থাকেন বৌদ্ধতন্ত্রের এই হারিতীই পরবর্তীকালে শীতলায় পরিণত হয়েছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই মতের পক্ষপাতী। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'শীতলা' ও 'হারিতী', কে কার কাছে ঋণী তা স্বীকার করতে গিয়ে তিনি শীতলাকেই হারিতীর কাছে ঋণী বলে মনে করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি তাঁর – 'Discovery of Living Buddhism in Bengal' গ্রন্থে যে বক্তব্য রেখেছেন তা হল—

> "It is difficult to ascertain whether, Hindus have taken Sitala from the Buddistic Hariti or The Buddists from the Hindus Sitala, I am inclined to think that the Hindus are the borrowers,"[১২]

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতই এই অভিমত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে—

> "বৌদ্ধগণের হারিতীদেবীও স্কন্দপুরাণ ও পিচ্ছিলাতন্ত্রোক্ত কয়েকটি শ্লোক হইতে নবশক্তি লাভ করিয়া এই বিস্ফোটক জ্বর পীড়িত বঙ্গদেশে সহজে পূজামণ্ডপে স্থান পাইলেন। ডোমাচার্যগণ পূজিত সিঁদুরমণ্ডিত ব্রনচিহ্নাঙ্কিত ধাতুময় মুখবিশিষ্ট অবয়ব ত্যাগ করিয়া ইনি হিন্দু ব্রাহ্মণের হস্তে মৃণালতন্তুসদৃশী মার্জ্জনীকলসোপেতা সূর্পালংকৃতমস্তকা শীতলা দেবী হইয়া দাঁড়াইলেন।"[১৩]

কিন্তু এই হারিতী প্রথমদিকে শিশুঘাতিনী হলেও পরে বুদ্ধ কর্তৃক উপদেষ্টা হয়ে তিনি হলেন শিশুপালিকা। দেবী ষষ্ঠীও শিশুপালিকা। তাই পুরাণের 'ষষ্ঠী' ও 'জাতাপহারিনী'-র সঙ্গে দেবী হারিতীর আংশিক সাদৃশ্য থাকলেও দেবী শীতলার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। আসলে শীতলা হলেন অনার্য সমাজ থেকে উদ্ভূতা লৌকিক দেবী। বৌদ্ধতন্ত্রে 'পর্ণশবরী' নামে আরেক দেবী আছেন। কোনো কোনো পণ্ডিত এই 'পর্ণশবরী'-র সঙ্গে শীতলার অভিন্নতা কল্পনা করেছেন। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতে তান্ত্রিক দেবী পর্ণশবরী নাম পরিবর্তন করে বাংলায় শীতলায় পরিণত হয়েছেন।

'সাধনমালা'-গ্রন্থে বিক্রমপুর থেকে প্রাপ্ত পর্ণশবরীর মূর্তির পদতলে গুটিবসন্তে সমাচ্ছন্ন একটি মনুষ্যমূর্তির কথা উল্লিখিত হয়েছে। উক্ত পর্ণশবরীর মূর্তির দুই পাশে অশ্ববাহিত দুটি গর্দভের মূর্তিও সেখানে বর্তমান। তাই মনে করা হয়–

> "পর্ণশবরী শুধু নাম পাল্টাইয়া বাংলাদেশে শীতলায় পরিণত হইয়াছেন এরূপ অনুমান যুক্তিযুক্ত।"[১৪]

সাধনমালায় বর্ণিত হয়েছে –

> "Under the legs in the image are shown human beings apparently suffering from the deadly dceases, as is evident from circular marks of small pox on one of the person,"[১৫]

কিন্তু, তান্ত্রিক দেবী পর্ণশবরীর সঙ্গে শীতলার যুক্তকরণের সূত্রটি একেবারেই স্পষ্ট নয়। ত্রিমুখবিশিষ্টা, ত্রিনেত্রা, ষড়ভুজা, ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা, ব্রজপরশু-ধনুর্বানধারিনী এই দেবীর সঙ্গে দুর্গা বা চণ্ডীর যদিও কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় কিন্তু দেবী শীতলার সঙ্গে পর্ণশবরীর অভেদ কল্পনা যুক্তিযুক্ত নয়। ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য তাঁর 'হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে দেখিয়েছেন সরস্বতী, লক্ষ্মী, গঙ্গা ও দুর্গার আংশিক সমন্বয়ে শীতলার উৎপত্তি। এই প্রসঙ্গে ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের মত হল—

> "বাহন গর্দভ, কুলা ও ঝাঁটা বাদ দিলে শীতলার সঙ্গে সরস্বতী, গঙ্গা, লক্ষ্মী, দুর্গা, ষষ্ঠী প্রভৃতির সাদৃশ্য স্পষ্ট।"[১৬]

শীতলার উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রাজ্ঞ সমালোচকদের মতামত ও শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদির নানা তথ্য প্রমাণের কথা স্বীকার করে নিয়েও এ কথা বলা যেতেই পারে, দেবী শীতলা আদিম প্রাজ্ঞ সমাজ থেকেই উদ্ভূতা। শাস্ত্রীয় দেবদেবীর অনেক আগে থেকেই এদেশে হাড়ি, ডোম, লোধা, খেরিয়া, চণ্ডাল, শবর, মুণ্ডা প্রভৃতি 'অন্ত্যজ' শ্রেণির লোকেদের কাছে দেবী শীতলা পূজিতা হয়ে আসছেন। প্রকৃতপক্ষে অনার্য স্তরের তথাকথিত পরবর্তী কালের উচ্চ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবে পুরাণে ও তন্ত্রে নবরূপে শীতলার আবির্ভাব ঘটে। পুরোহিততন্ত্রের ক্ষমতায়নের ফলে অনার্য দেবী শীতলা ক্রমশ শাস্ত্রীয় দেবী শীতলার রূপ পরিগ্রহণ করেন। এ যেন শীতলার আভিজাত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিম্নসমাজজাত শীতলাকে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠার ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের এক প্রয়াসমাত্র।

লোকায়ত সমাজের যারা শীতলার পূজা করে থাকেন স্থানীয় ভাষায় তাদের 'দেহূরী', 'লায়া', 'পাহান' বলে। শীতলার পূজকেরা শুধু শীতলা পূজাই করেন না, তারা বসন্তরোগের গ্রামীণ চিকিৎসকরূপেও কাজ করেন। 'দেহূরী' বা শীতলার পূজারীরা বলির বিকল্প হিসাবে কোথাও কোথাও নিজের ডান জানু কেটে দেবীকে উৎসর্গ করেন। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় ছাগ, মেষ, হাঁস, মুরগি বলি দেওয়ার রীতি প্রচলিত। দারিদ্র্যকবলিত গ্রামে কোথাও কোথাও দেবীর নৈবেদ্যরূপে জলতুলসী দিয়েও পূজা করে থাকেন।

দেবীর মূর্তি নির্মাণের কল্পনাটি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালের হলেও একুশ শতকীয় লোকায়ত সংস্কৃতিতে দেবীর কোনো সুনির্দিষ্ট মূর্তি কল্পনা করা হয়নি অর্থাৎ তিনি নিরাকার। রাঢ় বঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলের অমসৃণ ঝামাপাথর, পোড়া মাটির হাতি-ঘোড়া তৈরি করে অথবা পিতলের কলসির উপর পিতলের মুখ বসিয়ে বা মাটির কলসির উপর মাটির মুখ বসিয়ে দেবীরূপে পূজিতা হন। আবার কোথাও কোথাও টুকরো কাঠ বা পাথরের উপর সিঁদুর লেপন করে উন্মুক্ত বট, শাল, নিম প্রভৃতি বৃক্ষের নিচে দেবীর পূজা হয়। আবার শাস্ত্রীয় বর্ণনা অনুযায়ী দেবীর পূর্ণ বিগ্রহও কোথাও কোথাও পরিলক্ষিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত হালিশহরের ৯ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট শীতলামূর্তিও দেখা যায়। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের প্রাচীন মল্লরাজাদের অন্তঃপুরে শীতলার একটি সুপ্রাচীন পটমূর্তির কথা জানা যায়। তবে এই মূর্তিটিকে জনসমক্ষে আনার বিধি নেই। শারদীয়া নবমীর রাতে মূর্তিটির পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে এই পটমূর্তিবিশিষ্ট দেবী 'খচ্চরবাহিনী' নামে প্রসিদ্ধা। এছাড়াও কোথাও কোথাও শীতলার ক্ষুদ্র ধাতুখচিত মূর্তির সন্ধানও পাওয়া যায়। লোকায়ত সংস্কৃতিতে দেবী শুধু বসন্তরোগের অধিষ্ঠাত্রীই নন, তিনি সর্বরোগ-প্রশমণকারিণী ও প্রজননের দেবী হিসাবেও পূজালাভ করে থাকেন। দেবী কলস থেকে আরোগ্যসুধা প্রদান করেন ও মার্জ্জনী দ্বারা রুগির কষ্ট লাঘব করেন। শীতলা কৃষিদেবী হিসাবে পোকামাকড় বিনাশ করে ফসলের ঝাড়াই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দেবীর কুলো ও ঝাঁটা কৃষিকেন্দ্রিক সংস্কৃতির প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হয়। তাই কৃষিতে সাফল্যলাভের জন্য দেবী শীতলার আরাধনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

সমগ্র ভারতবর্ষের অধিকাংশ অঞ্চলে শীতলাপূজার অঙ্গ হিসাবে জড়িয়ে থাকে দেবীর প্রশস্তিমূলক গীত বা গান। উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন স্থানে বসন্ত রোগের প্রকোপ দেখা দিলে ওই অঞ্চলে মেয়েরা শীতলার প্রশস্তিমূলক নানা গান গেয়ে থাকেন। আসাম অঞ্চলে এই গানকে বলা হয় 'আইনাম', উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে একে 'মাতা-মাঈকি' গান বলা হয়। বাংলাদেশের যশোহর, খুলনা অঞ্চলের মানুষেরা কলস বা ঘটস্থাপন করে যে দেবীর পূজার আয়োজন করে থাকে সেখানেও অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকে শীতলার গীত। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে রাজবংশি সম্প্রদায় আয়োজিত শীতলার বাৎসরিক পূজা উপলক্ষ্যে যে 'মাগুন' অনুষ্ঠিত হয়, সেখানেও মেয়েরা বাড়ি বাড়ি প্রদক্ষিণ করার সময় শীতলার বন্দনা, পূজাগান, প্রার্থনাগান, মাগুনগান ও শেষে বিসর্জন গান গেয়ে থাকেন। ফাল্গুন থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান এইসব অঞ্চলে বা জেলায় পেশাদারী গানের দল পাওয়া যায়, যারা শীতলার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক গান গেয়ে থাকেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যারা শীতলার মাহাত্ম্যমূলক গান পরিবেশন করেন তারা 'শীতলাপণ্ডিত' নামে প্রসিদ্ধ। শীতলার মহিমাজ্ঞাপক এই বন্দনাগীতিকে 'মঙ্গলগান', 'মায়ের গান', 'সয়লা গান' বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে এই গান সাধারণত তিনদিন ধরে গাওয়া হয়ে থাকে। কোথাও কোথাও পাঁচ বা আটদিন ধরে গান গায়বার রীতিও লক্ষ্য করা যায়। মেদিনীপুরের তমলুকের নারিকেলদহের নিকটস্থ বামনারা গ্রামে শীতলা পূজা উপলক্ষ্যে আট দিনের 'সয়লা' গানের আসর বসে। এছাড়াও মেদিনীপুরের অন্যান্য বহু স্থানে, যেমন তমলুক, কোলাঘাট থানার অন্তর্গত অঞ্চলে পাঁচ দিনের 'সয়লা' গানের আসরও বসতে দেখা যায়। হারমোনিয়াম, খোল, করতাল সহযোগে সুছন্দে ও তালে চামর দুলিয়ে মূলগায়ক গান পরিবেশন করেন।

একাধিক দিনে নানা পালায় বিভাজিত শীতলার এই প্রশস্তিমূলক শীতলার গান পরিবেশন সূত্রেই জন্ম নিয়েছিল শীতলার মাহাত্ম্যমূলক এক বিশেষ আখ্যানধারা, যা কালক্রমে 'মনসা', 'চণ্ডী' ও 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের সাম্যসূত্রে 'শীতলামঙ্গল'-এর কাব্যকাঠামোয় বিন্যস্ত হয়। কৃষ্ণরাম দাস, নিত্যানন্দ চক্রবর্তী, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর, দ্বিজ দুর্গারাম, মাণিকরাম গাঙ্গুলী, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, রামেশ্বর ঘোষ, কবিবল্লভ ও দ্বিজ শম্ভুসূত প্রমুখ একাধিক কবি শীতলামঙ্গলের বিভিন্ন পালা রচনা করেছেন। বেশিরভাগ কবিই দু-একটি করে খণ্ডপালা রচনা করেছেন বলে জানা যায়। যেমন: রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'মগ' পূজাপালা,মানিকরাম গাঙ্গুলির 'মণিপুর' পালা, কবিবল্লভ দৈবকীনন্দনের 'চন্দ্রকেতুপালা' ও দ্বিজ শম্ভুসূত 'লবকুশপালা' লিখেছেন। আবার কৃষ্ণরাম দাস, হরিদেব, রামেশ্বর ঘোষের মত কবিদের আটটি করে শীতলার পালার সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে শীতলামঙ্গলের সবথেকে প্রাচীনতম কবি কে তা নিয়ে সংশয় থাকলেও শীতলামঙ্গলের প্রাচীনতম কবি হিসাবে কৃষ্ণরাম দাসকেই ধরা হয়। শীতলামঙ্গলের সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্তী এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কেননা তারই অধিক পালা পাওয়া গেছে। আচার্য সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে কবি নিত্যানন্দকে 'জাগরণপালা' ও 'গোকুলপালা'-র রচয়িতা বলে উল্লেখ করেছেন। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য কবিকে 'বিরাট পূজা পালা' ও 'গোকুল পূজা পালা'র রচয়িতা বলে মনে করেছেন। কিন্তু পুষ্প অধিকারী সম্পাদিত 'বাংলা সাহিত্যে শীতলামঙ্গল' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে নিত্যানন্দের এগারোটি পালা আবার শ্যামল বেরা সংগৃহীত ও সম্পাদিত নিত্যানন্দের শীতলামঙ্গলের অন্য পাঁচটি স্বতন্ত্র পালা পাওয়া যায়। তাই কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্তী যে শীতলামঙ্গল কাব্যধারায় সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শীতলার গীত বা ব্রতকথা প্রচলিত থাকলেও শীতলার মাহাত্ম্যমূলক আখ্যান বা শীতলামঙ্গল কাব্য শুধুমাত্র বাংলাদেশেই পাওয়া যায়। হাওড়া, হুগলী, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বিশেষ করে মেদিনীপুর অঞ্চলের কবিরা ছিলেন এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত। পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই সময়পর্বে যদি 'মনসামঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'ধর্মমঙ্গল', 'অন্নদামঙ্গল' প্রভৃতি কাব্যগুলির রচনাকাল ধরা যায় তাহলে সমালোচকদের মত স্বীকার করে নিয়ে বলা যেতে পারে শীতলামঙ্গল বা এই জাতীয় কাব্য রচনার সময়কাল হল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত। এ পর্যন্ত যতগুলি শীতলামঙ্গল কাব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে তার বেশিরভাগই রচিত হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। আঠারো শতকের বাংলার সমাজ ব্যবস্থা ছিল নানানভাবে বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। ইংরেজদের শাসন ও শোষণ, বর্গী আক্রমণ ও নবাবি শাসনের অরাজকতার কারণে মানুষ হয়ে পড়েছিল অসহায়। গ্রাম থেকে শহর ও শহর থেকে গ্রামের এই শ্রীহীন সমাজের শ্রী ফিরিয়ে আনার জন্য আর্তপীড়িত, শোষিত, মানুষেরা শীতলার কাছে নিরাপদ আশ্রয় প্রার্থনা

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 299 - 309
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করেছিল, চেয়েছিল নিরাময়। এ সমাজে ধনী, দরিদ্র, রাজা-প্রজা, উচ্চ-নীচ সকলেই দেবীর রোষের শিকার আবার দেবীর পূর্ণকুম্ভে সকলের জন্য আছে শুশ্রূষার জল।

অন্যান্য কাব্যের মতই 'শীতলামঙ্গল' কাব্যেও দেখা যায় অষ্টাহ পালার সাধারণ কাহিনিকাঠামো। মঙ্গলকাব্য প্রথাগত প্রকরণ অনুযায়ী দিবানিশা পালায় বিভাজিত হয়ে উপস্থাপিত হয়। 'চণ্ডীমঙ্গল' অথবা 'অন্নদামঙ্গল'-এর ষোলোটি পালা দিবানিশা এইভাবে বিভাজিত আটটি দিনে গীত হয়। শীতলামঙ্গল কাব্যের আখ্যান বিশ্লেষণের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে বিভিন্ন কবি ভিন্ন ভিন্ন নামে শীতলার কথা লিখলেও সাধারণভাবে পালাগুলির মধ্যে আখ্যানগত সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। শীতলার জন্মবৃত্তান্তে দেখি শাস্ত্র অনুযায়ী শীতলা তিনবর্ণের। যথা– রক্তবর্ণা, কৃষ্ণবর্ণা, শ্যামবর্ণা। তবে শীতলার জন্মপালায় অধিকাংশ কবিই যজ্ঞের আগুন থেকে উৎপন্না কৃষ্ণবর্ণের শীতলার জন্মকাহিনিই লিখেছেন। কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্তী কৃষ্ণবর্ণা শীতলার কাহিনিকে উপস্থাপন করেছেন এইভাবে –

"করিল পুত্রেষ্টি যজ্ঞ নহুষ রাজন্।
কত মুনি ঋষি আইল কে করে গণন।।
নির্বিঘ্নে করিয়া যজ্ঞ দিলেক আহুতি।
হইলেক পূর্ণ যজ্ঞ সবে শান্ত হৈল মতি।।
যজ্ঞপূর্ণে নিভাইল যজ্ঞের অনল।
তাহে জনমিল এক কন্যা সমুজ্জ্বল।।
মস্তকে ধরিয়া কুলা বাহির হইলা।
দেখি প্রজাপতি তারে যত্নে সুধাইলা।।
কে তুমি সুন্দরী কন্যা কাহার গৃহিণী।
কি হেতু অগ্নিতে ছিলা কহ সে কাহিনী।।
দেবী কন অগ্নিকুণ্ডে মম জন্ম হইল।
কোথা যাই কি করিব পরাণ বিকল।।
শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা কহিলা বচন।
যজ্ঞ শীতলের কালে তোমার জনম।।
সেহেতু শীতলা নাম তোমার হইল।
মম বাক্যে যাহ তুমি শীঘ্র ভূমণ্ডল।।"[১৮]

আবার শ্যামল বেরা সম্পাদিত নিত্যানন্দের শীতলামঙ্গলে পাই রক্তবর্ণা ও শ্যামবর্ণা শীতলার জন্মকাহিনি। রক্তবর্ণা শীতলার জন্মকাহিনি থেকে জানা যায় দেবীর প্রথম জন্ম হয় বৈকুণ্ঠ। আদ্যাশক্তির অংশ হওয়ায় দেবীর বর্ণ তখন ভগবতীর মত রাঙা। জ্বর, ব্যাধি, মাড়ি, মহামারী প্রভৃতি থেকে ত্রিলোক রক্ষার্থে দেবী দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার স্খলিত বিন্দু থেকে পদ্মফুলে জাত এই কন্যাই হল শ্যামবর্ণা শীতলা। দেবীর জন্মকাহিনির এই বৈচিত্র্যটুকু বাদ দিলে কাব্যের অন্যান্য পালাগুলিতে শীতলামঙ্গলের কাহিনিকাঠামো প্রায়ই একইরকম। প্রথমেই স্বর্গে পূজা প্রতিষ্ঠা তারপর পাতাললোক ও মর্ত্যলোকে দেবী হিসাবে স্বীকৃতি লাভের উদ্দেশ্যে পূজা প্রতিষ্ঠা। কবিদের এই কাহিনি পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে শীতলামঙ্গল কাব্য। কোনো কোনো কবির ক্ষেত্রে খণ্ড আখ্যান বিশিষ্ট পালা হয়ে উঠেছিল একমাত্র অবলম্বন। আসলে সঠিকভাবে পর্যালোচনা করলে শীতলামঙ্গলের প্রত্যেকটি পালা পাঠকের হৃদয়ে এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আখ্যানপাঠের আবেদন বহন করে। তবে 'মনসামঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল' বা 'ধর্মমঙ্গল'-এর মত মঙ্গলকাব্যগুলি যেভাবে কাব্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত, সেই তুলনায় শীতলামঙ্গলের মত কিছু কাব্য বা পালাগুলি আমাদের সমাজে রয়ে গেছে অবহেলিত। সম্ভবত প্রচারের অপ্রতুলতা সমাজে প্রতিষ্ঠা না পাওয়ার অন্যতম কারণ। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলি যেভাবে প্রচার পেয়েছে ও সমাজে সমাদৃত হয়েছে শীতলামঙ্গলের ক্ষেত্রে তেমনটি হয়নি।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 299 - 309
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আমাদের মনে রাখতে হবে সমাজ সংস্কৃতির ঐতিহ্যরক্ষা ও ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে শীতলামঙ্গলের খণ্ডপালা এবং অখণ্ডকাব্য অতি মূল্যবান সম্পদ। বিভিন্ন বিদ্যাচর্চা কেন্দ্রে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই অপ্রচলিত কাব্যচর্চার প্রতি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিচর্চার অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত কাব্যগুলি বৃহত্তর পর্বে আলোচনার দাবি রাখে। কেননা আমাদের সংস্কৃতির মূল ভিত্তিই হল প্রাগার্য সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অনুবর্তন। সেই সুবাদেই সংস্কৃতির প্রকৃত আদল পুনরুদ্ধার ও পুনর্বিচারের প্রয়োজন বোধে বৃহত্তর পরিসরে সাহিত্যের পুনর্পাঠ অত্যন্ত দরকারি। বাংলা বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে 'মনসামঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'ধর্মমঙ্গল'-এর অতিপ্রাধান্যের ফলেই উপেক্ষিত রয়ে গেছে 'শীতলামঙ্গল', 'গঙ্গামঙ্গল', 'লক্ষ্মীমঙ্গল', 'রায়মঙ্গল', 'কপিলামঙ্গল', 'সারদামঙ্গল', 'পঞ্চাননমঙ্গল' এর মত বেশ কয়েকটি মঙ্গলকাব্য। একথা সত্য যে, উপরোক্ত সবকটি কাব্যই বিভিন্ন দেবদেবীর মাহাত্ম্যমূলক কাহিনিকে আশ্রয় করে নির্মিত। কিন্তু এই সকল কাব্যে ধর্মীয় কাহিনির অন্তরালে নিহিত আছে গভীর বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি যা একজন ঐতিহাসিকের কাছে নিঃসন্দেহে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। হরিদেবের শীতলামঙ্গল সম্পাদনা প্রসঙ্গে পঞ্চানন মণ্ডল এই ধরণের কাব্যগুলিকে ইতিহাস বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, কাব্যে উপস্থাপিত যে ইতিহাস নিহিত থাকে সে শুধু তথ্যের ইতিহাস নয়, সে হল মানব মনের ইতিহাস বিশ্বাসের ইতিহাস। 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'-র পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমানে আজ ভয়াবহ বসন্ত রোগের অভিশাপ থেকে বহু মানুষ মুক্তি পেলেও, এখনও সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে দেবী শীতলা সমানভাবে পূজিতা। শুধু ভারতেই নয় পশ্চিমবঙ্গের অনেক স্থানেই বিশেষত রাঢ় বাংলার লোকায়ত ও নাগরিক সমাজে শীতলার উৎপত্তি ও জনপ্রিয়তা যথেষ্ট।

Reference:

১. মুখোপাধ্যায়, অতনুশাসন (সম্পাদিত), দশদিশি, শীতলামঙ্গল সমগ্র (৩৩ ও ৩৪ তম ভাগ একত্রে), কলকাতা ৭০০১০৭, ২০১৮-১৯ সাল, পৃ. ৭
২. তদেব, পৃ. ৮
৩. বসু, নগেন্দ্রনাথ (সম্পাদক), সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (পঞ্চম ভাগ), প্রবন্ধ–শীতলামঙ্গল, প্রাবন্ধিক – ব্যোমকেশ মুস্তাফী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা ৭০০০০৬, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৯-৩০
৪. তদেব, পৃ. ২৯
৫. Sacred Book of The East, Dr, Morice, Bloomfield, edited by Maxmular, All the clamdon press, 1857, P. 414
৬. স্কন্দপুরাণম্, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, শ্রী নটবর চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩১৮ সাল, পৃ. ২৭৫৪
৭. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড এবং সপ্তর্ষি প্রকাশন এর যৌথ উদ্যোগে, কলকাতা ৭০০০৭৩; ২০১৫, পৃ. ৭১৯
৮. বসু, নগেন্দ্রনাথ (সম্পাদক), সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (পঞ্চম ভাগ), প্রবন্ধ–শীতলামঙ্গল, প্রাবন্ধিক–ব্যোমকেশ মুস্তাফী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা ৭০০০০৬, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৮
৯. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড এবং সপ্তর্ষি প্রকাশন এর যৌথ উদ্যোগে, কলকাতা ৭০০০৭৩, ২০১৫, পৃ. ৭১৭
১০. বসু, নগেন্দ্রনাথ (সম্পাদক), সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (পঞ্চম ভাগ), প্রবন্ধ–শীতলামঙ্গল, প্রাবন্ধিক–ব্যোমকেশ মুস্তাফী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা ৭০০০০৬, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৮-২৯
১১. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড এবং সপ্তর্ষি প্রকাশন এর যৌথ উদ্যোগে, কলকাতা ৭০০০৭৩, ২০১৫, পৃ. ৭১৮
১২. Haraprasad Sastri, Discovery Of Living Buddhism in Bengal, Sanskrit Press Depository, First Edition – 1897, P. 20
১৩. সেন, দীনেশচন্দ্র, (সম্পাদক) নিমাইচন্দ্র পাল, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, সারস্বত কুঞ্জ, কলকাতা ৭০০০০৯,

সারস্বতকুঞ্জ সংস্করণ ২০০৯, পৃ. ১১৯

১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড, প্রথম ভাগ), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ, ২০১১-২০১২, পৃ. ১০৪

১৫. Benoytosh Bhattacharya, Sadhanmala, Vol -11, Oriental Institute, Baroda, 1928, P. 112

১৬. ভট্টাচার্য, ড. হংসনারায়ণ, হিন্দুদের দেবদেবী, উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (তৃতীয় পর্ব), ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০১২, ২০১৫, পৃ. ১৫১

১৭. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড এবং সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা ৭০০০৭৩, ২০১৫, পৃ. ৭২০-৭২১

১৮. মুখোপাধ্যায়, অতনুশাসন (সম্পাদিত), দশদিশি, শীতলামঙ্গল সমগ্র (৩৩ ও ৩৪ তম ভাগ একত্রে), কলকাতা ৭০০১০৭, ২০১৮-১৯ সাল, পৃ. ৩২৪-৩২৫